তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না.....

দিলীপ ঘোষ

বছর কয়েক আগের কথা। তখনও সরকারি চাকরি করি। সেদিন কোনও কারণে বাড়ি ফেরার পথে বড় শপিং মলটায় ঢুকতে হয়েছিল। সেখান থেকে বেরোতেই রাস্তার উল্টোদিকের ছোট্ট রেস্তোরাঁটার কফির সুবাস টান দিল জোরসে। ঢুকে পরে ফাঁকা টেবিলের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ পেছনে থেকে বাজখাঁই গলায় হাঁক, "এই যে খোকা, সরকার উঠে গেল নাকি? ভরসন্ধ্যেবেলা মৌজ করে কফি খাওয়ার তাল করছ?" ষাট ছুঁই ছুঁই আমাকে 'খোকা' বলে ডাকার মতো একটি গোষ্ঠীই আছে এই চত্বরে। পেছন ফিরে দেখি তাঁরাই। সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজের প্রাক্তনী, সত্তর পার করেছেন কিন্তু তারুণ্য অটুট। একটা চেয়ার টেনে সসম্ভ্রমে বসলাম ঐ টেবিলেই, ঈষৎ জড়সড় হয়ে, পুরোনো অভ্যাস। সেদিন জনা পাঁচেক হাজির আড্ডায়, দু'জন এককালের জাঁদরেল বাইলাইনওলা প্রাক্তন সাংবাদিক, একজন প্রাক্তন আমলা - আমার বস-প্রতীম, অন্যজন অধ্যাপনা করতেন; পঞ্চম ব্যক্তি অপরিচিত। তাঁর বয়সও কম অন্যদের থেকে এবং তিনিও আমারই মতো, কিঞ্চিৎ জড়সড়। এখানে জমকালো সব গল্প খইয়ের মত ফোটে। আমার ভূমিকা মূলত শ্রোতার। সাম্প্রতিক কিছু তথ্যের জন্যে এঁরা আমার দিকে মাঝে মধ্যে তাকান বটে, তবে সেটা লেখার সময় ডিকশনারি দেখার মতো, কশ্চিৎ–কদাচিৎ।

প্রাক্তন আমলা জিজ্ঞেস করলেন," আর ক'দিন হে?" বললাম, "মেরে এনেছি স্যার, বছর দেড়েক আর!" বললেন, "এক্সেলেন্ট, রিয়েল গোল্ডেন ইয়ারস, বুঝলে, তবে একটা জিনিষ মিস করতাম রিটায়ারমেন্টের পরে। চাকরি করার সময় অনেক ক'টা কাগজ আর ম্যাগাজিনের খরচা দিত সরকার, কিন্তু পড়ে উঠতে পারতাম না। রিটায়ার করার পর অঢেল সময়, কিন্তু পেনশনের টাকায় অতগুলো কাগজ কিনতে গা করকর করে।"

আমি বললাম, "সেটা বোধহয় আমার সমস্যা হবে না। এখন তো জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক, বেশির ভাগ কাগজ আর পত্রপত্রিকাই আইপ্যাডে পড়ি, ছাপা কাগজ এসে পৌঁছনোর অনেক আগেই পড়া হয়ে যায় অনেক কিছু।"

প্রাক্তন কলমচি ত–দা বললেন, "তুমি তো বেশ টেক স্যাভি দেখছি! ভাল। এবার একটা কাজের কথা বলি। তোমরা তো নানা রকম রিপোর্ট-টিপোর্ট বার কর? বেশির ভাগই অখাদ্য ইংরেজিতে লেখা!"

ত–দা কোন দিকে যাচ্ছেন সেটা না বুঝে সহমত হওয়া রিস্কি। তাকিয়েই রইলাম। ত–দা থামলেন একটু, তারপর সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "এঁর নাম ---------- । দীর্ঘদিন একটা ইংরেজি পাক্ষিকে কাজ করেছেন। তোমাদের ঐ পাঠাভ্যাস পরিবর্তনের ঠেলায় কোম্পানি স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করেছে সম্প্রতি। পেনশন যা পাচ্ছে তাতে সংসার চালানো দায়, কিছু ছোটখাট কাজের ভরতুকি দরকার। তোমাদের রিপোর্টগুলো কপি এডিট করতে দাও না ওঁকে?"

অদ্ভুত সমাপতন। সেই বছরেই একটি বড় মিডিয়া হাউসের পত্রিকা বিভাগে আমার চেনা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরাও নানান কিছু করছেন সংসার প্রতিপালন করতে। মানুষ ছাপায় পড়ছেন, না কম্পিউটার স্ক্রিনে, তার সঙ্গে ছাপাখানার কিম্বা সার্কুলেশনের কর্মীদের কর্মসংস্থানের সম্পর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু যাঁরা লিখছেন বা সম্পাদনা করছেন, তাঁদের কাজে টান পড়বে কেন? ত–দা বিষয়টা ব্যাখ্যা না করে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খেতেই থাকলো। সত্যিই চাকরি খোয়াচ্ছেন সাংবাদিকরা ডিজিটাল সংস্করণের জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে? এদেশের কোনও তথ্য দেখতে পাইনি।(এখানে নিগৃহীত না হলে সাংবাদিকরা সাধারণত ঠাঁই পান না সংবাদে।) বিদেশে এই নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। সেগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আমেরিকান সোসাইটি অফ নিউজপেপার এডিটরস[1] ১৯৭৮ সাল থেকে সংবাদ মাধ্যমে কর্মীদের সংখ্যা এবং হাল হকিকৎ-এর খবর নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তাঁদের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সাল থেকে আমেরিকার নিউজ রুমে সর্বক্ষণের কর্মীদের সংখ্যার হ্রাস পেয়েছে এইভাবে ২০০৭ – ২৪০০, ২০০৮ – ৫৯০০, ২০০৯ – ৫২০০, ২০১১ – ১০০০, ২০১২ – ২৬০০। ২০১৪ সালে নিউজ রুমে ৩৮০০ কর্মী চাকরি খুইয়েছেন। সংবাদপত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকরাও কর্মহীন হয়েছেন বড় সংখ্যায়। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০১৪ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখছি, গত পাঁচ বছরে সাধারণ পাঠ্য পত্রিকাগুলির ৩৫০০০ কর্মী কাজ হারিয়েছেন।[2] কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পশ্চিমী দুনিয়ার সর্বত্রই এই ছবি। কারণ, কাগজ চালু রাখার মূল উৎস, বিজ্ঞাপন সরে যাচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে। খবরের কাগজের ছাপা সংস্করণ প্রকাশ করা ক্রমশই সাধ্যাতীত হয়ে উঠছে প্রকাশকদের। পিউ রিসার্চ সেন্টারের আর একটি প্রতিবেদন[3] অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০১৪–এর মধ্যে ছাপা সংবাদপত্রের কাটতি বা সার্কুলেশন কমেছে ৩ শতাংশ; বিজ্ঞাপন থেকে প্রায় ৫ শতাংশ কম আয় হয়েছে, অন্যদিকে, ডিজিটাল সংস্করণগুলিতে ওই কালপর্বেই বিজ্ঞাপন থেকে আয় বেড়েছে ৩ শতাংশ; সামগ্রিক ভাবে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমেছে ৪ শতাংশের মতো, যার অর্থমূল্য প্রায় ১৯০০ কোটি ডলারে।

ডিজিটাল মিডিয়ায় কিছু কর্মসংস্থানও হচ্ছে, কিন্তু ছাপা কাগজ থেকে যারা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের সবাই যে ডিজিটাল সাংবাদিকতায় পুনর্বাসিত হচ্ছেন এমন নয়। নির্দিষ্ট সংখ্যাটা খুঁজে পাইনি এখনও। অস্ট্রেলিয়ার ৯৫ জন বরখাস্ত হওয়া সাংবাদিকদের নিয়ে একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে যে তাঁদের মধ্যে কেবল ২৫ শতাংশ এক বছরের মধ্যে সাংবাদিকতার কাজে ফিরতে পেরেছেন। বাকিরা কম সম্মানজনক, অন্য ধরনের, বেশিরভাগ সময়েই ঠিকা পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যান্য দেশেও কর্মচ্যুত সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা এরকমই বলে দেখছি বিভিন্ন প্রতিবেদনে।

পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের তথ্য দিয়ে ভারতের পরিস্থিতি বিশদ ভাবে বোঝার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বায়িত বাজারে এক দেশের সঙ্কটের আঁচ অন্য দেশেও পড়ে, অবশ্যই তীব্রতার কম বেশি থাকে। আন্তর্জালে ভারতীয় সাংবাদিকদের নিয়ে বিশদ তথ্য খুঁজে পেলাম না। পরিচিত কয়েকজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের হাল দেখে প্রশ্ন জাগছিল এদেশে কী হচ্ছে? ইন্ডিয়া মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট ২০১৫[4] অনুযায়ী, ২০১৪ সালে টাকার মূল্যে টিভি সবচেয়ে বড় মিডিয়া, প্রায় ৪৭৪৯০ কোটি, আর তার পরেই মুদ্রিত মাধ্যম ২৬৩৪০ কোটি। ডিজিটাল সবে ৪৩০০ কোটি ছুঁয়েছে। কিন্তু যদি বৃদ্ধির হারের নিরিখে দেখি তাহলে মুদ্রিত মাধ্যম বেড়েছে ৮ শতাংশ আর ডিজিটাল বেড়েছে ৪৪.৫ শতাংশ। এঁদের হিসেব অনুযায়ী আগামী দিনে অর্থাৎ ২০১৯ নাগাদ ডিজিটাল বাড়বে ৩০ শতাংশ হারে, মুদ্রিত মাধ্যম ৮ শতাংশ বৃদ্ধির হারই ধরে রাখবে। মুদ্রিত মাধ্যমের অবস্থা পশ্চিমের দেশের চেয়ে এখানে ভাল কারণ জনসংখ্যা আর সাক্ষরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ছাপা কাগজের বিক্রি বাড়ছে, বাড়ছে বিজ্ঞাপনও।

তবে চাকরি কেন খোয়াচ্ছেন সাংবাদিকরা? রিপোর্টটা আর একটু তলিয়ে দেখার পরে আবিষ্কার করা গেল ছাপা কাগজের কাটতি বেড়ে চললেও পত্রিকার, বিশেষ করে সাধারণ-বিষয় ভিত্তিক পত্রিকার কাটতি কমছে। বেশ কিছু এই ধরনের পত্রিকা ছাপা সংস্করণ বন্ধ করে কেবল ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করছেন।কিছু পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে। বেশি দামী নির্দিষ্ট-বিষয় ভিত্তিক পত্রিকাগুলি, যেমন গাড়ি কিম্বা ফোটোগ্রাফি কিম্বা কম্পিউটার ইত্যাদি, বেড়ে চলেছে তাদের নিজস্ব কোণটিতে। সামগ্রিকভাবে মুদ্রিত মাধ্যমের উপার্জনে পত্রিকার অবদান এমনিতেই খুব কম, আপাতত ৫ শতাংশ মতো। এই দশকের শেষে সেটা ৩.৬ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়াবে বলে দেখানো হয়েছে রিপোর্টে। ২০১৪ সালে পত্রিকাগুলির আয় বেড়েছে মাত্র ৪.৪ শতাংশ, ২০১৯ সালে সেটা কমে হবে ০.৩ শতাংশে।

আমার হিসেব এতক্ষণে মিলল। চাকরি খুইয়ে যে সব সাংবাদিক বন্ধুরা অন্য ধরনের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশই কোনও না কোনও পত্রিকাতে ছিলেন। মুদ্রিত সাধারণ বিষয়ক পত্রিকা লুপ্ত হতে চলেছে। এদের মধ্যে কোনও কোনও পত্রিকা হয়তো ডিজিটাল সংস্করণে চলতে

---

[1] http://www.poynter.org/2013/asne-census-finds-2600-newsroom-jobs-were-lost-in-2012/216617/

[2] Pew Research Center, March, 2014, "State of the News Media 2014: The Growth in Digital Reporting: What It Means for Journalism and News Consumers."

[3] (http://www.journalism.org/2015/04/29/newspapers-fact-sheet/)

[4] https://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf

থাকবে, বিশেষত যেগুলি ইংরেজিতে। আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকাগুলি লুপ্তই হয়ে যাবে হয়তো। সেসব পত্রিকায় যাঁরা কাজ করেন এখন তাঁদের কেউ কেউ হয়তো লেগে পড়বেন 'কর্পোরেট কমিউনেকশন' জাতীয় কোনো কেজো লেখায়। ডিজিটাল মিডিয়াম কিছু নেবে, কিন্তু 'সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেসন' ইত্যাদি বিদ্যায় যাঁরা যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন না তাঁদের জন্য কী পড়ে থাকবে? প্রাইভেট টিউশন অথবা খুচরো কপি এডিটিং? বিদেশে তাই ঘটছে। সাধারণ বিষয়ক পত্রিকায় যাঁরা লেখেন তাঁদের একটা বিশেষ ধরনের দক্ষতা থাকে বলে মনে হত। আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ব্যাখ্যা করার দক্ষতা, ঝড়ো হাওয়া আর পোড়ো দরজাটা মিলিয়ে একটা সামগ্রিক ভাষ্য রচনা করার দক্ষতা। আমার নিজের বড় হয়ে ওঠার সময় এই দক্ষতার সামর্থেই সাধারণ বিষয়ক পত্রিকাগুলো সত্য এবং কল্পনা, তথ্য এবং সাহিত্যের পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করতো; এবং করতো বলেই অত্যন্ত সাধারণ মেধা নিয়েও অনেক কিছুর স্বাদ নিতে শিখেছিলাম। পাঠকের রুচি নির্মাণের দুরূহ কাজটা অলক্ষ্যে এবং নীরবে সারতেন এঁরা। সংবাদ এবং সংবাদ ভাষ্য নির্মাণের জন্য ক্রাউডসোর্সিং, নাগরিক-সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা নতুন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার নামে এই দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কি ভুলতে বসেছি আমরা? কারিগরি দক্ষতা, চটজলদি নেটে পোস্ট করার কুশলতার তুলনায় যদি সেটার মূল্য কম দিতে চায় মিডিয়া - তাহলে সত্যিই সঙ্কটে পড়বে সভ্যতা। সেই সঙ্কট ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সংবাদ এবং তার ভাষ্যের নামে সত্য, মিথ্যা এবং খেউড়ের বিচিত্র জগাখিচুড়ি ইদানীং জুটছে নানান মাধ্যমে।

তথ্য থেকে সংবাদ, সংবাদ থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা – সত্যের বিভিন্ন স্তরের কোনও একটা দুর্বল হলেই বাকিটা ধ্বসে যাবে। তাই যাঁরা এই প্রক্রিয়ার মুখ্য কলাকুশলী, তাঁদের নিয়ে একটু কথা হোক।